গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ১৫ - ২১ এপ্রিল ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস জনগণের

প্রত্যেক পরিবারেরই মাসিক খরচ এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এক ছোট ব্যবসায়ীর খরচ বেড়েছে মাসে ৩৫০০ টাকা। এক বেসরকারি সংস্থার কর্মীর মাসিক খরচ বেড়েছে ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা। অন্য পরিবারেরও খরচ অনুরূপভাবে বেড়েছে। তাঁরা পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন কীভাবে? খরচে কাটছাঁট করে। কেউ মাংস কেনা কমিয়েছেন, কেউ ফল। কোনও পরিবারে ওষুধেও কাটছাঁট করতে হচ্ছে। এর পরিণাম কী? অপুষ্টি। যথাযথ চিকিৎসা না হওয়া। শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যু। তাই বলা হয় মূল্যবৃদ্ধি একটি নিঃশব্দ ঘাতক।

সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি মানুষের সহনসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গত দু'সপ্তাহে বারো বার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভোজ্য তেল সহ সব খাদ্যদ্রব্যের দাম। রান্নার গ্যাস হাজার টাকা। সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে সবকিছুর দাম। সরকার কী ভূমিকা

দুয়ের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেলের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ

পেট্রল-ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যের ভোট পর্বের পর থেকে পেট্রল-ডিজেলের দাম যেভাবে বাড়ছে এবং তার ফলস্বরূপ পাল্লা দিয়ে যেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য শাসক বিজেপি ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাত দিচ্ছে, কিন্তু নানা ধরনের সেস ও কর প্রত্যাহার করছে না। এতে তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি

দুয়ের পাতায় দেখুন

সংগ্রামী বামপন্থাকে শক্তিশালী করার আহ্বান নিয়ে এসেছে মহান ২৪ এপ্রিল

আগামী ২৪ এপ্রিল দেশ জুড়ে সাম্যবাদের স্বপ্নদর্শী বামপন্থী মানুষ গভীর মর্যাদার সঙ্গে পালন করবেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস।

দিনে দিনে দুঃসহ পরিস্থিতির ভার আরও বেশি করে চেপে বসছে জনগণের ওপর। পেট্রল-ডিজেল-জ্বালানী গ্যাস-খাদ্যশস্য-ভোজ্য তেল-শাকসবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্য অগ্নিমূল্য। সংসার খরচ এক ধাক্কায় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বাড়তি পরিশ্রম করেও সে খরচ জোগাড় করার সুযোগ নেই। দেশের কর্মক্ষম কোটি কোটি মানুষ ভয়াবহ বেকার সমস্যায় জেরবার। অতিমারির প্রকোপ শুরু হওয়ার আগেই বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছিল। এরপর গত দু'বছরে কোভিড ও লকডাউনের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেছে আরও লক্ষ লক্ষ ছোট-বড়-মাঝারি কলকারখানা, ব্যবসাপত্র। কাজ চলে গেছে কোটি কোটি মানুষের। আরও কয়েক কোটি মানুষ অর্ধেক বা তারও কম বেতনে কোনওক্রমে চাকরি টিকিয়ে রেখেছেন। দোকান-বাজারে কেনা-বেচায় মন্দা। ফসলের দাম পাচ্ছেন না চাষি। ছোট কৃষক ও কৃষি-মজুররা আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছেন ঋণের জালে। দারিদ্র ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সমাজে নারী নিরাপত্তা চূড়ান্ত বিপন্ন।

এই অবস্থায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো দূরে থাক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাদের ওপর একের পর এক সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে চলেছে। এই দুর্দিনে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে গ্যাসের ভর্তুকি। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেলেও সরকারি দপ্তরের শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ করা হচ্ছে না। বিদ্যুতের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসার মতো জরুরি পরিষেবাগুলিকে বাজারের পণ্য করে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিনামূল্যের ওষুধের

সাতের পাতায় দেখুন

হাঁসখালির কিশোরীর ধর্ষণকারীদের শাস্তি চাই

রাজভবনে তুমুল বিক্ষোভ

উত্তরপ্রদেশের হাথরস-কাণ্ডের স্মৃতি ফিরিয়ে দিল নদীয়ার হাঁসখালির ভয়ঙ্কর ঘটনা। সেখানে এক ১৪ বছরের কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়ে শুধু প্রাণ হারিয়েছে তাই নয়, তার মৃতদেহটিও জোর করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবারকে হুমকি দিয়ে পুলিশে সময়মতো অভিযোগও করতে দেওয়া হয়নি। ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে আছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের একদল নেতা-কর্মীর দাপট।

১১ এপ্রিল রাজভবনের সামনে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ। পুলিশ ৪১ জনকে গ্রেফতার করে। আহত হন বেশ কয়েকজন কর্মী। (নীচে) মহিলা বিক্ষোভকারীর গলা চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুরুষ পুলিশকর্মী

এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ১১ এপ্রিল এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজভবনের গেটে বিক্ষোভ দেখিয়ে দাবি করা হয়—কিশোরীর ধর্ষণ, হত্যা ও কোনও ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া মৃতদেহ পোড়ানোর সাথে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, শাসক দলের নেতা-কর্মীদের ঔদ্ধত্য এবং সারা রাজ্যে খুন-সন্ত্রাস-ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। টেনে-হিঁচড়ে ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে যায়। দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এই নৃশংস ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তির দাবি করেন।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এসইউসিআই(সি) কর্মীরা। পুলিশের দলদাস ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন তাঁরা। অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষোভ হয়। একটি প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে হাঁসখালি থানাতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। (আরও ছবি চারের পাতায়)

২৪ এপ্রিল

শহিদ মিনার ময়দান
বিকাল ৩টা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা - **কমরেড প্রভাস ঘোষ**
সভাপতি - **কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য**

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি

একের পাতার পর

পালন করছে? সরকারের দাবি ভারত-শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানের মতো ডুবন্ত অর্থনীতির দেশ নয়, দেশের কোষাগারে নাকি প্রচুর অর্থ মজুত আছে। দেশ নাকি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মানুষ এগোচ্ছে কোন দিকে?

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির ভুয়ো তত্ত্ব

সরকারে যে-ই থাক পেট্রোপণ্যের দাম ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। কেন এমন মূল্যবৃদ্ধি? সরকারি বয়ান— আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছে তাই দেশের বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে। সরকারের কিছু করার নেই, এখন বাজারই দাম নিয়ন্ত্রণ করে। এই বক্তব্য কি সঠিক?

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে বিক্ষোভ

বিচার করে দেখা যাক। আন্তর্জাতিক বাজারে সারা বছর ধরে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা করে। তাই গড় দাম ধরে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন ক্ষমতায় বসেন তখন আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ৯৩.১৭ ডলার। অর্থাৎ নয় বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধি ব্যারেল প্রতি ১.৬৫ ডলার। বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের কম।

প্রতি লিটার পেট্রলে ডিলার কমিশন ও ভ্যাট ছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিপুল পরিমাণে ট্যাক্স চাপায়। পশ্চিমবঙ্গে ১০০ টাকার পেট্রলে কেন্দ্র ও রাজ্য যথাক্রমে ৩১ টাকা ও ২৫ টাকা আর ডিজেলে যথাক্রমে ৩৪ টাকা আর ১৭ টাকা ট্যাক্স চাপায়। অর্থাৎ পেট্রলে প্রতি ১০০ টাকায় ৬৫ টাকাই হল কেন্দ্র ও রাজ্যের ট্যাক্স। আর ডিজেলে ১০০ টাকার মধ্যে ৪২ টাকাই হল সরকারের ট্যাক্স। তাহলে দাম কে বাড়াচ্ছে? বিশ্ববাজার, না ভারতের সরকার?

সরকার চালাতে ট্যাক্স অবশ্যই দরকার। কিন্তু তা জনগণের উপরই চাপানো হবে কেন? দেশের সিংহভাগ সম্পত্তি যাদের হাতে সেই পুঁজিপতিরা পাবে ট্যাক্স ছাড়, কোটি কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ, পুঁজিপতিদের ফেরত না দেওয়া ঋণের দায় বইছে সরকার, ট্যাক্সের টাকায়। আসলে তা বইছে জনগণ? এই যদি অবস্থা হয় তাহলে মূল্যবৃদ্ধি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে!

পেট্রল ও ডিজেল শুধুমাত্র গাড়িতে ব্যবহৃত হয় না। পণ্যবাহী ট্রাক, ট্রেন চলে ডিজেলে। কৃষিক্ষেত্রে সেচের কাজে ডিজেল ব্যবহৃত হয়। শুধু পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়েছে তা তো নয়, জমিতে ব্যবহৃত ট্রাক্টর, তার প্রতিটি যন্ত্রাংশ, টায়ার, সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, সব কিছুর দাম প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। ফলে চাষের খরচ বেড়েছে, কিন্তু কৃষক ফসল বেচে দাম পাচ্ছে না। সরকারও এমএসপি বাড়াচ্ছে না। ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষক, অভাবী কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল বাড়ছে। অথচ বাজারে সবজি তরকারি আলু পেঁয়াজ তেল মাছ মাংস ডিম ফল সহ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কতটা মূল্যবৃদ্ধি

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসার সময় মানুষ যে টাকায় এক কিলো আটা কিন্তু আজ সেই টাকায় পাওয়া যাবে মাত্র ৪৫০ গ্রাম। এক কিলো চাল কিনতে তখনযে টাকা লাগতো আজ সেই টাকায় পাওয়া যায় মাত্র ২২৫ গ্রাম চাল। ১ কেজি আলু বা পেঁয়াজ কিনতে তখন যত টাকা লাগত সেই টাকায় এখন পাওয়া যাবে মাত্র ৫০০ গ্রাম। আচ্ছে দিন আনার কথা বলেমোদী যখন ক্ষমতায় বসছেন তখন একটা গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪১০.৫০ টাকা। আর এখন তার দাম প্রায় হাজার টাকা। স্কুল ফি-ও বেড়েছে ১০৫ শতাংশ, কলেজে ফি বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। এছাড়া পড়াশোনার অন্যান্য খরচ বৃদ্ধি তো আছেই। বিদ্যুতের খরচও ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। তার উপরে অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ৮০০টি অতি প্রয়োজনীয় ও জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিল। প্রায় প্রতিদিন একটু একটু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা জিনিসের দাম বাড়তে বাড়তে আজ প্রায় ১০৫ শতাংশ থেকে ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে পুঁজিবাদী আর্থিক সংস্কার ও লকডাউনের জেরে

পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় বিক্ষোভ। ৮ এপ্রিল

বেশিরভাগ মানুষের আয় তলানিতে। প্রতিদিন বেকারত্বের গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। যারা কাজ করছে তাদের কখন কাজ চলে যাবে কেউ জানে না। সেই সময় আপনি যখন বাজারে জিনিস কিনতে যাচ্ছেন তখন দেখছেন গত মাসে যে টাকায় সংসার চালিয়েছিলেন এ মাসে সেই একই টাকার সংসার চালাতে পারছেন না। অথচ মূল্যবৃদ্ধি সরকারের কোনও চিন্তার বিষয় নয়। দুর্নীতি বেকারি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এর মতোই মূল্যবৃদ্ধিও আজ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে যেখানে প্রতিদিনই তা বাড়ছে তো বাড়ছেই। জনতার অবস্থা ধীরে ধীরে প্রবল সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। দেশে গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অসাম্য অতিকায় আকার ধারণ করছে। অপুষ্টি বাড়ছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। অপর দিকে মুষ্টিমেয়র ধন-সম্পদ ক্রমাগত বাড়ছে। বাড়ছে সাংসদ বিধায়কদের জন্য খরচ। যে সমস্ত সাংসদ বিধায়করা জনতার ভোটে পরাজিত হয়ে প্রাক্তন তাদেরও অবসরকালীন ভাতা, পেনশন, নানা সুবিধা, প্রশাসনিক নানা খরচ, সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, মন্ত্রী- সাংসদ-বিধায়কদের পিছনে গাড়ির সংখ্যা, তাঁদের নিরাপত্তার পিছনে বিপুল পরিমাণ খরচ ক্রমাগত বাড়ছে।

জ্বালানি তেল ও গ্যাসের লাগামহীন দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

কেন মূল্যবৃদ্ধি

এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার সরকারি নীতি, তাদের মুনাফা ক্রমাগত বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতি। আগেই দেখানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারের দাম কমা বাড়ানো নয়, সরকারি নীতিই পেট্রোপণ্যের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। দেশে তো খাদ্যপণ্যের কোনও অভাব নেই, করোনা অতিমারির সময় সরকার ঘোষণা করেছিল, দেশে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য মজুত আছে। সরকার খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করছে। তাহলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে কেন? খাদ্যদ্রব্যের এই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কারণ মজুতদারি ও কালোবাজারি। বিজেপি সরকারের আমলে তা আরও বেড়েছে। এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি রুখতে সরকার কি পারত না আরও কঠোর হাতে আইন প্রয়োগ করতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দামের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিতে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কঠোর নজরদারি চালাতে। অসাধু কালোবাজারি ও মজুতদারদের কঠোর শাস্তি দিতে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের দায়ও কিছু কম নয়। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে গঠিত রাজ্য টাস্কফোর্সের কী টাস্ক তা জনগণ দেখতেই পায় না। প্রশ্ন উঠছে এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির দুর্দিনে কোথায় সরকার? কোথায় গেল রাজ্যের মানুষকে সুশাসন দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি? কোথায় গেল কেন্দ্রীয় সরকারের আইন?

আসলে এই দেশের মধ্যে দেশ দুটি, একটি ধনীর অপরটি গরিবের। রাজনীতিও দুটি। একটি ধনীর স্বার্থরক্ষার রাজনীতি, তার নাম সংসদীয় গণতন্ত্র।ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের রাজনীতি। এর দ্বারা পুঁজিপতিরা ঠিক করে কোন দল আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় গিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির খাঁড়া নামিয়ে আনবে। এই ব্যবস্থায় দেশের আসল মালিক পুঁজিপতিদের, কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে সরকারি দলগুলি। আর বাকি নিরানব্বই শতাংশ খেটে খাওয়া মানুষ তারা মারা গেল, না বাঁচল, তাতে সরকারের কিছুই যায় আসে না। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে নয়, তারা ব্যস্ত খাদ্যপণ্যের ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির মালিকদের প্রবেশের ঢালাও সুযোগ করে দিতে। তার জন্য আইন বদলাতে। এই অসহনীয় পরিস্থিতির অবসানের দাবিতে, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের অধিকারগুলি রক্ষার জন্য, দাবিগুলি আদায় করার জন্য, মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

পেট্রল-ডিজেলের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ

একের পাতার পর

পেলেও সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজ্যের শাসক দল কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, কিন্তু রাজ্য সরকারি কর প্রত্যাহার করে মানুষের সমস্যার কোনও সুরাহা করছে না।

তাদেরও স্বার্থ রাজস্ববৃদ্ধি। সরকারি কোষাগার ভরানোর এই প্রতিযোগিতার মাঝে পড়ে গরিব-মধ্যবিত্তের জীবন জেরবার হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে চাল-ডাল-আলু-শাকসবজি-মাছ সমেত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যে ভূমিকা পালন করতে পারত তাও করছে না। ভোটসর্বস্ব শাসকদলগুলির এই নীতিহীন রাজনীতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এর বিরুদ্ধে গণকমিটি গঠন করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করছি।

বিপ্লববিরোধী রাজনীতি উদঘাটিত করতে না পারলে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া যায় না

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনা 'ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের সমস্যাবলি' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

...বিপ্লবের জন্য তিনটি শর্ত দরকার—(১) বিপ্লবের সঠিক রাজনৈতিক লাইন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শ, (২) সঠিক বিপ্লবী পার্টি, অর্থাৎ যে পার্টি যথার্থই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে, আর (৩) জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দৃঢ়বদ্ধ সংগ্রামী ফ্রন্ট। যখন এই তিনটি শর্ত গড়ে ওঠে একসঙ্গে, তখনই বুঝতে হবে বিপ্লবের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য এই তিনটি শর্ত একই সঙ্গে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। শুধু জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে—এইটুকু হলেই হবে না। ...

আন্দোলনের রাস্তা ঠিক কি না, আন্দোলনের আদর্শ ঠিক কি না, আন্দোলনের নেতৃত্ব ঠিক কি না—আন্দোলনের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো বিচার করা একান্ত দরকার। তা ছাড়া আন্দোলনের মধ্যে আরও অনেক জিনিস লক্ষ রাখতে হয়। লক্ষ রাখতে হয়, আন্দোলনের মধ্যে কোন কোন দল, আন্দোলনের যে শত্রুপক্ষ, তার সাথে তলে তলে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কারণ, আপনারা মনে রাখবেন, শত্রুপক্ষ বা বুর্জোয়া শ্রেণি গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে শুধু যে সরাসরি আঘাত করে তা নয়, তারা আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের এজেন্টও রাখে। শত্রুপক্ষের এইসব এজেন্টরা জনগণের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে বাইরে লোকদেখানো আন্দোলনের মহড়া দেয়, গণআন্দোলনের মধ্যে কখনও কখনও সত্যিকারের বিপ্লবীদের থেকেও অনেক বেশি জঙ্গি ভাব দেখায়। আবার একই সাথে তারা শত্রুপক্ষের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং সুযোগমতো জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্টে ফাটল ধরায়, বিভেদ সৃষ্টি করে। এইভাবে সত্যিকারের গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের হয়ে তারা কাজ করে। তা ছাড়া, বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাটাকে পালটে ফেলার জন্য যে কাজটা করা আসল দরকার, গণআন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে সেই সংযুক্ত মোর্চা রূপে বিপ্লবের উপযোগী জনগণের সংগ্রামের নিজস্ব হাতিয়ার শ্রমিক-চাষির সংগ্রামী গণকমিটিগুলি একেবারে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তর পর্যন্ত কিছুতেই নানা অজুহাতে এইসব দল গড়তে দেয় না। তারা বরং তার পরিবর্তে যে কোনও উপায়ে নিজেদের দলীয় শক্তিবৃদ্ধিকেই এবং জনতার ওপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধিকেই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বোঝাতে চায় এবং শাসকদলবিরোধী বিভিন্ন পার্টিগুলির মধ্যে ওপরে ওপরে যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে, তাকেই চিরকাল জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্ট বলে চালাবার চেষ্টা করে। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এইসব দল কার্যকরী ও প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কখনও কখনও যে মারমুখী লড়াই এরা পরিচালনা করে, তার দ্বারা জনতাকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লবী দল থেকে জনগণকে সরিয়ে রাখার চক্রান্ত করে। গণআন্দোলনের মধ্যে এরাই হচ্ছে ধুরন্ধর সোসাল ডেমোক্রেটিক শক্তি, যাদেরই বিপ্লবী শাস্ত্রে বলা হয় 'কম্প্রোমাইজিং ফোর্স বিটুইন লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল', অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি। বাইরের বুকনি এবং আচরণ দেখে এদের আসল চরিত্র সাধারণ মানুষ ধরতে পারে না। গণআন্দোলনের মধ্যে এদের চতুরতা এবং বিপ্লববিরোধী রাজনীতি উদঘাটিত করে জনগণ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া যায় না।

... রাষ্ট্রশক্তি বলতে কী বোঝায়, তা আপনাদের ভাল করে জানা দরকার। আপনাদের জানা দরকার, এই রাষ্ট্রশক্তিই আসলে বর্তমানের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে রক্ষা করছে। এই রাষ্ট্রশক্তির মূল তিনটি 'অর্গান' বা স্তম্ভ, যাদের সাহায্যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে সে রক্ষা করে। রাষ্ট্রশক্তির এই মূল তিনটি অর্গান বা স্তম্ভ হচ্ছে— সৈন্যবাহিনী, বিচারবিভাগ এবং পুলিশ সহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের এই যে তিনটি অর্গান, নির্বাচনে সরকার বদলের দ্বারা এর চরিত্র পাল্টায় নাকি? আপনারা মনে রাখবেন, নির্বাচনে সরকার বদলের দ্বারা রাষ্ট্রের এই তিনটি অর্গানের চরিত্র পাল্টায় না। নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সরকার পাল্টানো হোক, 'ক্যু' (ষড়যন্ত্রমূলক সামরিক অভ্যুত্থান) করেই সরকার পাল্টানো হোক, অথবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে দলবদল করেই সরকার পাল্টানো হোক— এই যে রাষ্ট্রের তিনটি অর্গান, যা একটা যন্ত্রের মতো একটা বিশেষ ধাঁচায়, একটা বিশেষ রূপে, একটা বিশেষ ঢংয়ে গড়ে উঠেছে, তার পরিবর্তন হয় না। যেমন, একটা মেশিন বিভিন্ন পার্টস নিয়ে একটা বিশেষ ঢংয়ে তৈরি, একটা বিশেষ ধরনের কাজ করবার জন্য। অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি সেই মেশিনটাকে যেমনভাবেই চালাক—খারাপ ভাবে হোক, ভাল ভাবে হোক—ঐ মেশিন দিয়ে সেই ধরনের কাজই হবে, যে ধরনের কাজের জন্য মেশিনটি তৈরি। তেমনি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের মানসিক ধাঁচা, রীতিনীতি, গঠনপদ্ধতি, তার আইনকানুন সংক্রান্ত ধারণা, গণতন্ত্র সংক্রান্ত ধারণা, দেশ সংক্রান্ত ধারণা, জনতা সংক্রান্ত ধারণা—সমস্ত কিছু পুঁজিবাদকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে, পুঁজিপতি শ্রেণির শাসনকে রক্ষা করার জন্য একটা ধাঁচে তৈরি। আর, সরকার হচ্ছে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের মিস্ত্রি বা অপারেটর মাত্র। ফলে, শুধু সরকার বদলের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পাল্টায় না। তা হলে, রাষ্ট্রের এই যে মূল তিনটি অর্গানের সাহায্যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটা টিকে আছে, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে একেবারে নিচের স্তর থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত যে গণকমিটিগুলি গড়ে উঠবে, সেই গণকমিটিগুলি যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং উপযুক্ত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধারের ওপর এই তিনটি অর্গানের কাজ করার উপযুক্ত করে গড়ে না তোলা যায়, তা হলে বিকল্প রাষ্ট্রশক্তির জন্ম হতে পারে না। আর, এই কাজটি না হলে শুধু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার বদল করে কোনও দিন ক্রান্তি হবে না।

স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত শিক্ষার অধিকার আইন বিরোধী

কলকাতায় জি ডি বিড়লা, অশোক হল সহ তিনটি বেসরকারি স্কুল বন্ধকরে দেওয়ার প্রতিবাদে ইউনাইটেড গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য ৯ এপ্রিল বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা শুধু অমান্য করেছে তাই নয়, রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট ২০০৯-কেও লঙ্ঘন করেছে। এই আইনে ফি বৃদ্ধি বা অন্য কোনও কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট না দিয়ে, পরবর্তী শ্রেণিতে পড়তে না দিয়ে কর্তৃপক্ষ আইনবিরোধী কাজ করেছে। আইন যারা মানছে না, তারাই ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে বলে শোরগোল তুলছে। স্কুল খোলার নোটিশে তারা জানিয়েছে, যারা স্কুল কর্তৃক ধার্য ফি (হাইকোর্ট নয়) দিয়েছে তারাই ক্লাস করার অনুমতি পাবে।

তিনি বলেন, বেসরকারি স্কুলগুলো এত সাহস পায় কোথা থেকে। এই ঘটনা দেখাচ্ছে, রাজ্যে বেসরকারি স্কুলের এই দৌরাত্ম্য রুখতে আইন প্রণয়ন ও রেগুলেটরি বডি তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উচিত স্কুলগুলোর বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। এই অচলাবস্থা দূর করা এবং অবিলম্বে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য স্কুল খোলার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত মিড ডে মিল প্রকল্পের কর্মীরা চরম বঞ্চনার শিকার। তাদের ভাতা মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা। এই টাকা মেলে বছরে মাত্র ১০ মাস। মিড ডে মিল কর্মীদের কোনও রকম সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হয় না। 'সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে বহুবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই দুরবস্থার কথা জানানো হলেও সরকার কোনও সুরাহা করেনি।

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের উলুবেড়িয়া পৌরসভা শাখা কমিটির উদ্যোগে, বিশেষত দীর্ঘ ৬ মাস মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদে ৬ এপ্রিল মহকুমা অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদিকা সাগরিকা বর্মন, মিনতি সিং ও রুনু সিং।

করোনা-যোদ্ধাদের স্থায়ীকরণের দাবিতে কর্ণাটকে বিক্ষোভ

প্রায় দু'হাজার করোনা-যোদ্ধা স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে করোনা রোগীদের সেবা করে সুস্থ করলেও কর্ণাটকের বিজেপি সরকার এখন তাঁদের ছেঁটে ফেলেছে। এর বিরুদ্ধে এই করোনা যোদ্ধারা এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে বাঙ্গালোরে ফ্রিডম পার্কে তাঁদের কাজে বহাল রাখার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। ৯ এপ্রিল থেকে এই বিক্ষোভ দিন-রাত লাগাতার চলছে।

বন্যা প্রতিরোধ ঃ প্রশাসন জেগে ঘুমোচ্ছে

সরকারের কাজ কি শুধু জনগণের দাবি উপেক্ষা করা? পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের ভূমিকা দেখে এমনটাই মনে করছেন মানুষ। গত বর্ষায় জেলায় কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে ও অতিবর্ষণজনিত কারণে প্রায় সমস্ত ব্লক ভয়াবহ বন্যা ও জলবন্দি দুর্দশার কবলে পড়ে।

এরপর বন্যা প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনের চাপে জেলা প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দেয় আগামী বর্ষার পূর্বেই ওই সমস্যা সমাধান করা হবে। এ জন্য বেআইনি ইটভাটা ও মাছের ভেড়ি অপসারণ, খাল সংস্কার সহ বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু তারপর কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় চলে যায় প্রশাসন। বর্ষা আসতে চলল, এখনো পর্যন্ত খাল সংস্কারের বিশেষ কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি আন্দোলনে নামার উদ্যোগ নিচ্ছে। কমিটির উপদেষ্টা অধ্যাপক জয়মোহন পাল, সভাপতি উৎপল প্রধান, সহ সভাপতি অশোকতরু প্রধান, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, শীঘ্রই জেলাশাসক, সেচমন্ত্রী, সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এতে কাজ না হলে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জেলা দপ্তর অভিযান করা হবে।

রামপুরহাটে অবস্থান

নাগরিকদের নিরাপত্তা, বগটুইয়ের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি, নিহত-আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, পুড়িয়ে দেওয়া ঘর পুনর্নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্থায়ী চাকরি সহ ৭ দফা দাবিতে ৫ এপ্রিল রামপুরহাট মহকুমা দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করে এবং ডেপুটেশন দেয় এসইউসিআই(সি)।

প্রকাশিত হল

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৭৪-৩৩ সংখ্যায় 'পি এফে সুদ কমিয়ে...' লেখাটিতে তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'সুদ পাচ্ছে সরকার এবং বহু ডেমারেজের টাকাও সরকার পায়' অংশের বদলে হবে,

'দাবিদারহীন এবং হিসাব বহির্ভূত অবস্থায় (আনক্লেমড অ্যান্ড আনঅ্যাকাউন্টেড) পিএফ ফান্ডে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা পড়ে আছে। এই গচ্ছিত টাকার সুদ বাবদ পিএফ বহু কোটি টাকা আয় করে। পিএফ কর্তৃপক্ষ ড্যামেজ ও পেনালটি চার্জ বাবদও বহু কোটি টাকা আয় করে। স্বাভাবিক ভাবেই ইপিএফও-র বর্তমান বছরে সব আয় যুক্ত করে বিবেচনা করলে বার্ষিক সুদ ৮.৫ শতাংশ বহাল রাখা যায়। কমিয়ে তা ৮.১ শতাংশ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

এআইকেকেএমএসের জেলা সম্মেলন

ফসলের লাভজনক সহায়ক মূল্য ঘোষণা, ২৫০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান কেনা, সস্তায় সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জবকার্ড হোল্ডারদের ২০০ দিন কাজ, ৪০০ টাকা মজুরি, গরিব মানুষের বিধবা, বার্ধক্য ভাতা ও আবাস যোজনায় অন্তর্ভুক্তি সহ গ্রামীণ নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৭ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস)-এর দ্বিতীয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হয়। চারশোর বেশি কৃষক, খেতমজুর, জব কার্ড হোল্ডারের উপস্থিতিতে সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, সূর্য প্রধান, স্বদেশ পড়িয়া, প্রভঞ্জন জানা প্রমুখ। রাজ্য সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান কৃষকদের নানা সমস্যা, কেলেঘাই-কপালেশ্বরী নদীর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সহ অন্যান্য দাবিতে জেলা জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কৃষক-খেতমজুরদের আহ্বান জানান। সম্মেলনে পশ্চিম মেদিনীপুর (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠিত হয়। দুই জেলার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সূর্য প্রধান, স্বদেশ পড়িয়া এবং বঙ্কিম মুর্মু, প্রভঞ্জন জানা।

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবি

২৬ মার্চ বাঁকুড়ার আকাশ মুক্তমঞ্চে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠনগুলি যৌথ প্রতিবাদ সভায় দাবি ওঠে, স্বাস্থ্যসাথীর নামে মানুষের চিকিৎসাকে বিমা কোম্পানির দিকে না ঠেলে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে, সমস্ত মানুষের বিনামূল্যে উন্নত মানের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে, সরকারি হাসপাতালে ওষুধ ছাঁটাই নয়, বিনামূল্যে সমস্ত ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা হয়।

সভাপতিত্ব করেন এমএসসি-র জেলা সভাপতি ডাক্তার নীলাঞ্জন কুণ্ডু।

বক্তব্য রাখেন এসডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, এমএসসি-র জেলা সম্পাদক ডাঃ তন্ময় মণ্ডল, এইচওজেআরএস-এর জেলা সম্পাদক লক্ষ্মী সরকার প্রমুখ।

হাঁসখালিতে কিশোরী খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নদীয়ার হাঁসখালিতে কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ১১ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ হয়।

বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সভানেত্রী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার ১১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

রাজভবনের সামনে পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করছে দলের কর্মীদের

ঘাটশিলায় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ৮-১০ এপ্রিল ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ শিক্ষাকেন্দ্রে এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে দলের নেতা-সংগঠকদের নিয়ে 'মার্ক্সবাদ কেন একমাত্র মুক্তির দর্শন', 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ', 'সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র কেন অবশ্যম্ভাবী', 'কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার সংগ্রাম' প্রভৃতি নানা তত্ত্বগত বিষয়ে দু'দিন ধরে আলোচনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ১০ এপ্রিল ভোরে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তির পাদদেশে এই মহান নেতার এক বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ রেকর্ড থেকে শোনানো হয় (ডানদিকের ছবি)। কমরেড প্রভাস ঘোষ সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং পলিটবুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি, কমরেড কান্তিময় দেব, কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। শিবিরে ৫৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ

কোটি ছাত্রের স্বাক্ষর সংগ্রহের ঘোষণা

৫ এপ্রিল এআইডিএসও-র ডাকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল। সংসদ ভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, যন্তরমন্তরে পুলিশের সাজ সাজ রব সকাল থেকেই। সময় যত গড়াচ্ছে, ব্যারিকেডের সামনে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

কেরালা থেকে এসেছেন মিথুন আর। কী কারণে এতদূর থেকে আসা? স্পষ্ট উত্তর দিলেন—কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ লাগু করে আমাদের লেখাপড়ার যতটুকু সুযোগ ছিল তা-ও কেড়ে নিচ্ছে। এই শিক্ষানীতিতে স্কুল কলেজের ঢালাও বেসরকারিকরণের সুপারিশ রয়েছে। আমি সরকারি স্কুল থেকে সদ্য পাশ করেছি। সেই স্কুলটা পিপিপি মডেলে এক মালিককে বিক্রি করে দেবে। এরকম আরও অনেক স্কুল আছে। আমরা গরিব ঘরের সন্তান। টানাটানির সংসারে আমার দাদা বি এ পাশ করেছে। অনেক খরচ করে বি এডে ভর্তি হয়েছে। এখন যদি তিন বছরের বদলে চার বছরের বি এ কোর্সে আমায় পড়তে হয় তো টাকা কই? অথচ সরকার আমাদের সমস্যার কথা শুনতেই চাইছে না।

মঞ্চে ব্যানার বাঁধা শেষ করে নেমে এলেন গাজিয়াবাদের রাহুল সিং। বললেন, করোনার দু'বছরে অনলাইনে লেখাপড়া হয়নি। কিচ্ছু শেখেনি কেউ। তা সত্ত্বেও এই শিক্ষানীতি অনলাইনে লেখাপড়া বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞানের মতো বিষয় নিয়ে পড়া ছাত্রদের কী হবে বলুন তো? আমার সাবজেক্ট ইতিহাস। এই বিজেপি সরকার দেশে নানা ঐতিহাসিক জায়গার নাম বদলের সাথে ইতিহাস বইয়ের নানা ঘটনাও বদলে দিচ্ছে। ইতিহাসকে ওদের দলের মতো করে লিখছে। আমাদের ঠিক ইতিহাস জানতে দেওয়া হবে না। এর চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র আর কী হয়?

ওরা বলছে, সব বোর্ড তুলে দিয়ে একটাই কেন্দ্রীয় বোর্ড করবে। রাজ্যে রাজ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কেন্দ্রীয় এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হবে। পাশ করলে কোন রাজ্যে ভর্তির সুযোগ মিলবে ঠিক নেই। গরিব নিম্নবিত্ত ছাত্ররা ক'জন পারবে এলাকার কলেজ ছেড়ে ভিন রাজ্যে পড়তে? ছাত্রদের ক্ষোভের কারণ যথার্থ।

কিন্তু আপনারা শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের বিরোধিতা করছেন কেন? সরকার তো বলছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেলে কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষ ছেলেমেয়ে তৈরি হবে!

ভাঁওতা। সম্পূর্ণ ভাঁওতা। দেখছেন না, দেশে এখনই কত উচ্চশিক্ষিত বেকার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বসে আছে। তারা কেউ অযোগ্য নয়। আসলে দেশে বাজার নেই, মন্দার কারণে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে না। চাকরিও তেমন নেই। এ অবস্থায় কিছু হাতের কাজ শিখিয়ে দিলে চাকরি হবে?

জবাবি মুখের ভীড় বেড়ে চলেছে। বুকস্টলের সামনে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রী খুশবু ক্ষোভের সাথে বললেন, সরকার নবজাগরণের শিক্ষাচিন্তার বিপরীতে গিয়ে মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতার প্রসার ঘটাতে চাইছে। মেয়েদের আবার গৃহবন্দি করতে চাইছে। সভ্যতার সামনে এ বড় বিপদ। একে রুখতেই হবে।

একে একে মিছিল আসছে। প্রত্যয়ী মুখের ভিড় বেড়ে চলেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ বাতিলের দাবি নিয়ে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি ভি এন রাজশেখরের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে রওনা হয়েছেন। কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশনের সাধারণ সম্পাদক অমিয় মহান্তি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তার সিং সারাভা চেয়ার প্রফেসর ভীম ইন্দর সিং, জেএনইউ-এর অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ রায় প্রমুখ। ধরনা মঞ্চের সামনে তখন প্রায় সব রাজ্য থেকে আসা হাজার হাজার ছাত্রের সমাবেশ। তাদের উদ্দেশে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ বলছেন, 'এ লড়াই শিক্ষা মনুষ্যত্ব সভ্যতা বাঁচানোর লড়াই। ঘরে ঘরে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে এআইডিএসও। কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত আরও তীব্র করতে কোটি কোটি সই নিয়ে দিল্লি অভিযান হবে। প্রয়োজনে কৃষক আন্দোলনের মতোই দেশের ছাত্রসমাজ দিল্লি সহ গোটা দেশে শাসকদের অবরুদ্ধ করবে। প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে শিক্ষার অধিকার। মঞ্চে তখন সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে উপস্থিত অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সচিবমণ্ডলীর সদস্য গিরিবর সিং। সূর্য তখন মধ্য গগনে। রাস্তার দুধারে গাছের ঘন ছায়া ছোট হয়ে আসছে। ব্যারিকেডটা দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুলিশ, আধাসেনা, জলকামান সারি সারি। দুপুরের গনগনে রোদ মাখছে যন্তর মন্তরের ধরনাস্থল, প্রতিবাদী মুখ, আসমুদ্রহিমাচল।

দাবি আদায় সোনারপুরে

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নারায়ণপুর রোড দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য। অতিথি রিক্সা স্ট্যান্ড থেকে জগদীশপুর কাঠপোল সংলগ্ন খাল সংস্কার হয় না দীর্ঘদিন। অবিলম্বে এই রাস্তা এবং খাল সংস্কারের দাবিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পিডব্লুডি অফিসে জমা দেওয়া হয়। জনসাধারণের ক্ষোভ আঁচ করে রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের আগেই রাস্তা এবং ড্রেনের কাজ শুরু করে। দাবি আদায়ে স্থানীয় মানুষ দলের কর্মীদের অভিনন্দন জানান।

লঙ্কাচাষিদের সম্মেলন

৩ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ ব্লকের কুলটিকরীতে অল ইন্ডিয়া কিসান ও খেতমজদুর সংগঠনের পানিপারুল শাখার উদ্যোগে লঙ্কাচাষিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাঁচা লঙ্কার ন্যায্য দাম, লঙ্কা ও সবজি মাণ্ডি চালু, সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লব করণ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ, সুকুমার প্রধান, শুকদেব বর, মানস পণ্ডা প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

নীল সাদা ইউনিফর্ম খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত

রাজ্য সরকার সম্প্রতি সমস্ত স্কুল ইউনিফর্মের রঙ নীল-সাদা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবান্নের মতে, রাজ্য সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে একরঙা পোশাক চালু করে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে চাইছে। প্রশ্ন জাগে, নীল-সাদা রঙই বেছে নেওয়া হল কেন? আর কোনও রঙ কি বেছে নেওয়া যেত না? নাকি, এ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের প্রিয় রঙ বলেই তা বিল্ডিং, ফ্লাইওভার থেকে স্কুলপোশাক সর্বত্র সেই রঙ ব্যবহার করতে হবে? রঙ বা মতাদর্শ, শাসকের পছন্দ হলে সেটাই সব জায়গায় মান্যতা পাবে আর ভিন্ন মত বা রঙের জায়গা হবে না? এমন মনোভাবের পিছনে যে একপ্রকার একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা রয়েছে, সেটা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন কি?

শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য বিধানসভায় নীল-সাদা রঙের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, নীল-সাদা রং এক ধরনের শুভর প্রতীক। সাদা রঙ শান্তি বা শুভ-স্বচ্ছতার প্রতীক বলে জানি। কিন্তু নীল সাদা রঙের এমন বিশেষ 'শুভার্থবহ তাৎপর্য' আছে বলে জানা ছিল না। যাইহোক, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে। আসলে শিক্ষামন্ত্রী ভালো করেই জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় রঙ ছাড়া নীল সাদা রঙকে বেছেনেওয়ার আর কোনও কারণনেই। এই একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতাকে আড়াল করতে গিয়েই তিনি এমন বালখিল্যসুলভ মন্তব্য করেছেন।

নবান্নের শীর্ষমহলের বক্তব্য, রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পীদের সুবিধা করে দিতেই নাকি এই উদ্যোগ। এটিও একটি ভ্রান্ত যুক্তি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, প্রায় সব স্কুলেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্থানীয় দর্জি বা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ডেকে শিক্ষার্থীদের মাপ নিয়ে পোশাক তৈরি করানো হয়। বর্তমান ব্যবস্থাতেই ক্ষুদ্র শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের লাভ হয়। একে কেন্দ্রীভূত করে দিলে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরাই তার সুযোগ পাবে সেটা নিশ্চিত করতেই কি এই উদ্যোগ?

স্কুলগুলি যখন তাদের ইউনিফর্মের রঙ বা ডিজাইন ঠিক করে, তখন তাদের মাথায় রাখতে হয়, সেই স্কুলের অতীত ঐতিহ্যের কথা, তার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শের কথা এবং নানা ব্যবহারিক সুবিধার কথা। স্কুলপোশাক ও তার রঙ তাই স্কুলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সব স্কুলের পোশাকের রঙ একই হয়ে গেলে যেমন তার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হবে, তেমন তার সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতাকেও অগ্রাহ্য করা হবে।

বহু শিক্ষক শিক্ষিকাও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। প্রত্যেক স্কুলের পোশাকের রঙ একই হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের আলাদা করে চিনে নিতে সমস্যা হবে। আরও নানা ব্যবহারিক অসুবিধার কথা উঠে আসছে শিক্ষকদের বক্তব্যে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় সমস্যা কম নেই। সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত দৈন্যদশা প্রকট হয়ে উঠেছে করোনা মহামারীর সময়ে। অবৈজ্ঞানিক ও সেকেলে সিলেবাসেরও পরিবর্তন দরকার। ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। স্কুলপোশাকের 'রঙবদল' না করে রাজ্য সরকার বরং এইসব প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলি সমাধান করার দিকে মন দিক। তাতেই ছাত্রদের মঙ্গল।

জিতাংশু নাথ, কলকাতা-৫৯

বামপন্থার বুলি আওড়ে আপনারাও তো 'অনুদানের' রাজনীতিই করেছেন

সিপিএমের ২৬তম রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো জনমোহিনী প্রকল্পের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক 'সুবিধাভোগী শ্রেণির' মনোভাব তৈরি হয়েছে। এইসব অনুদানমূলক প্রকল্প যে মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির স্থায়ী কোনও সমাধান নয়, বরং রাজ্যে শিক্ষা, শিল্প বা কর্মসংস্থানের প্রশ্নগুলোই যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা তাঁরা মানুষকে বোঝাতে পারছেন না। ফলে তাঁদের লড়াই নাকি কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

খুবই বাস্তব এবং সৎ স্বীকারোক্তি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠে আসে, সিপিএম নেতা-কর্মীরা মানুষের সত্যিকারের ভাল কীসে হবে, বা যা মানুষের ন্যায্য অধিকার তা কেন দয়ার-দান হিসাবে নিতে হবে, সে-কথাগুলি মানুষকে ধরাতে পারছেন না কেন, মানুষই বা তাঁদের কথায় কান দিচ্ছেন না কেন? তবে কি তাঁদের কথায় মানুষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না বা বিশ্বাস করছেন না?

আগে দেখা যাক, সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনের লক্ষ্য কী ছিল। ন্যায্য অধিকারগুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা, তাঁদের জীবনের দুরবস্থাগুলি তুলে ধরে তার সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করে সংগ্রামী বামপন্থায় তাঁদের উজ্জীবিত ও সচেতন করা কি তার লক্ষ্য ছিল? তাদের ৩৪ বছরের শাসনের ইতিহাস বলছে— না, তৃণমূলের আজ যা লক্ষ্য, সেদিন সিপিএমের লক্ষ্যও তা-ই ছিল। তা হল, যেভাবেই হোক, ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। মানুষকে ভুলিয়ে, বাস্তবে কিছু সরকারি অনুদান পাইয়ে দিয়ে দলের অনুগত রাখা এবং এই ভাবে ভোট আদায় করে ক্ষমতার ভোগ-দখল কায়েম রাখা।

তাঁদের ৩৪ বছরের শাসনে সিপিএম নেতারা সাধারণ মানুষকে কখনও এ কথা বোঝাননি যে, তাঁদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির জন্য দায়ী আসলে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। পরিবর্তে মানুষকে তাঁরা বুঝিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে থাকো, তা হলেই সব পাবে এবং একমাত্র আমাদের সঙ্গে থাকলেই পাবে। কী পাবে? চাকরি পাবে? না, সকলের কাজ পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই এই ব্যবস্থায়। বেকারত্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য ফল। এর মধ্যেও যে-কটি চাকরির সুযোগ থাকে, তার একটি জুটতে পারে একমাত্র 'আমাদের' সঙ্গে থাকলেই। আর কী পাবে? আজ তৃণমূল যে সব প্রকল্প নিয়েছে সিপিএম আমলে সেগুলি এ-ভাবে না থাকলেও যে-সব সরকারি অনুদান প্রকল্প, পঞ্চায়েতি প্রকল্প ছিল সেগুলিও জুটত কেবল 'আমাদের দলে যোগ দিলেই'। অর্থাৎ শিক্ষা হোক বা কর্মসংস্থান, এগুলি যে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার, এটাই তাঁরা মানুষের থেকে আড়াল করে গেছেন। এ কথা মানুষকে বলেননি যে, বেকারত্বের কারণ বিপুল সংখ্যায় কল-কারখানা না হওয়া এবং এই কল-কারখানা না হওয়ার কারণ মানুষের চাহিদা না-থাকা নয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না-থাকা। এরই পাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ যাঁরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাও জমি হারিয়ে, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গিয়ে ক্রয়ক্ষমতা হারিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত তারাও জমি হারিয়ে, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে দারিদ্র সীমার নীচে নেমে গিয়ে ক্রয়ক্ষমতা হারিয়েছে। শ্রমিক ও কৃষক—সকলেই বেকার হয়েছে। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না-থাকাটা পুঁজিবাদী শোষণেরই ফল। তাঁরা মানুষকে কখনও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখাননি যে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান-বাসস্থান সংক্রান্ত প্রতিটি সমস্যার জন্য দায়ী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই একমাত্র এইসব দাবি অর্জিত হতে পারে। একটি যথার্থ বামপন্থী দল মানুষের মধ্যে এই চেতনার সঞ্চারের মধ্য দিয়ে তাঁদের পুঁজিবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের মধ্যে টেনে আনে। আর যতই মানুষ গণআন্দোলনে অংশ নেয় ততই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক এবং দমনমূলক চরিত্র তার কাছে স্পষ্ট হয়। সিপিএম নেতারা ৩৪ বছরের শাসনে মানুষকে এ-সব কোনও কিছুই বোঝাননি।

অন্য দিকে তাঁরা মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলেননি শুধু নয়, শোষণ-বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে, মূল্যবৃদ্ধি-বেকারত্বকে করে কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের যে বিক্ষোভ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী কায়দায় লাঠি-গুলি চালিয়ে সেগুলি দমন করেছেন। রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের প্রায় সবগুলিই তাদের দখলে ছিল। অথচ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলিতে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন তাঁরা কখনও গড়ে তোলেননি। মালিকদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে শ্রমিক আন্দোলানকে শুধুমাত্র কিছু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নামমাত্র কিছু পাইয়ে দিয়ে শ্রমিকদের ক্ষোভকে স্তিমিত করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজমিও তারা কেড়ে নিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে লাঠি-গুলি দিয়ে, ক্রিমিনাল বাহিনী নামিয়ে, খুন-ধর্ষণ করে দমন করে মালিকদের সন্তুষ্ট করেছেন। শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে, মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে সোসাল ডেমোক্রেটিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং বিনিময়ে পুঁজিপতি শ্রেণির কাছ থেকে গদিতে টিকে থাকার গ্যারান্টি আদায় করেছেন, আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন, প্রচার পেয়েছেন। এরই জোরে তারা সেদিন সব নির্বাচনে জিতেছেন, আজকের তৃণমূলের মতো সব কিছু দখল করেছেন। অর্থাৎ তৃণমূল সরকার আজ যা করছে, মুখে বামপন্থার কথা বললেও সিপিএম সরকারও সেদিন একই কাজ করেছে। মানুষকে অধিকার-সচেতন করার পরিবর্তে 'পাইয়ে দেওয়া' রাজনীতির মধ্য দিয়ে অনুগত নাগরিক তৈরির চেষ্টা করেছে। সরকারগুলির জনবিরোধী ভূমিকার জন্য এক দল মানুষ ভাবে, কিছুই তো পাওয়া যায় না, তার চেয়ে বরং যা জুটছে তাই লাভ। মানুষের এই মনোভাবের জন্য যেমন তৃণমূল সরকার দায়ী, তেমনই সিপিএম সরকারও সমান দায়। তা হলে আজ সিপিএম নেতাদের কথা মানুষ বিশ্বাস করবে কেন?

তৃণমূলের এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি কোনও নতুন মডেল নয়। রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং জাতীয় দলগুলির দৌলতে এই রাজনীতিরই আজ রমরমা। সিপিএম আগে এ রাজ্যে করেছে, এখন কেরালায় করেছে, তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার দল করেছে, দিল্লিতে আপ করছে, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি করছে, রাজস্থানে কংগ্রেস করছে। ক্ষুব্ধ জনগণকে সামান্য কিছু ছুঁড়ে দিয়ে 'সন্তুষ্ট রাখতে' বুর্জোয়া রাজনীতির এটাই এখন চল। অর্থাৎ স্থায়ী কাজ তৈরির মধ্য দিয়ে স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থার পরিবর্তে হাতে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া। এতে দুটো উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এক দিকে ভোটব্যাঙ্ক সংহত হয়, অন্য দিকে তলানিতে চলে যাওয়া মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়ে এবং পুঁজিপতিদের পণ্যের বাজার কিছুটা চাঙ্গা হয়। আর এই পুঁজিবাদী রাজনীতির তলায় চাপা পড়ে যায় মানুষের ন্যায্য অধিকারগুলি।

সিপিএমের জনসমর্থন বিধানসভা ভোটে যে তলানিতে এসে ঠেকেছিল, সে কথা স্বীকার করে সম্মেলনের প্রতিবেদনে আত্মসমীক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই আত্মসমীক্ষাটি যে কী, তার উল্লেখ সম্মেলনের প্রতিবেদনে নেই। প্রতিবেদনে এর উল্লেখ না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কোনও রকম 'আত্মসমীক্ষা' করতে তাঁদের রাজ্যের মানুষ আজ পর্যন্ত দেখেননি। জনসমর্থন যে তাঁরা হারিয়েছেন তাদের বুর্জোয়া কায়দায় সরকার চালানো, একের পর এক জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ নেওয়া, বিরোধী মতকে গায়ের জোরে ও পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দমন করা, খুন এবং সন্ত্রাস চালানো, ব্যাপক দলবাজি, নেতাকর্মীদের লাগামছাড়া দুর্নীতির জন্য—তা কি তাঁরা কখনও রাজ্যের মানুষের কাছে স্বীকার করেছেন? করেননি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নামিয়ে আনা এবং কৃষকবিরোধী নীতি নিয়েছেন, আজ পর্যন্ত সে সব অন্যায় স্বীকার করেননি। এগুলি যদি স্বীকার না করেন, তবে আত্মসমীক্ষা কথাটির ব্যবহার নিচু তলার কর্মী-সমর্থকদের ভোলানো ছাড়া আর কী কাজে লাগবে?

এ কথা স্পষ্ট, পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে তৃণমূল সরকারের ভূমিকায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে। সবজির দাম আকাশছোঁয়া। ভোজ্য তেল, রান্নার গ্যাস, জ্বালানি তেলের দাম

সাতের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের জয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অভিনন্দন এআইইউটিইউসি-র

দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের গৌরবময় জয়ে এআইইউটিইউসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে হরিয়ানার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অভিনন্দন জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। ৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ১৯ দফা দাবিতে হরিয়ানার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা ১১৮ দিন ধরে লাগাতার যে ঐতিহাসিক ধর্মঘট চালালেন, তার ফলশ্রুতিতে তাঁরা অধিকাংশ দাবিই আদায় করেছেন। তিনি বলেন, আন্দোলন ভাঙতে সরকার ও শ্রমিকবিরোধী শক্তিগুলির সমস্ত রকমের দমন-পীড়ন ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ মোকাবিলা করে হাজার হাজার নিপীড়িত মহিলা-কর্মী ঐক্যবদ্ধভাবে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালালেন, শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাসে তা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। এই আন্দোলনে এআইইউটিইউসি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী শ্রমিকবিরোধী সরকারগুলির ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে এই ঐতিহাসিক আন্দোলন নিঃসন্দেহে প্রেরণা জোগাবে।

এআইএমএসএস-এর অভিনন্দন ঃ ৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ছবি মহান্তি হরিয়ানার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের আন্দোলনের জয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সংগঠন বিশ্বাস করে, এই ঐতিহাসিক ও সফল আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশে আরও অনেক জঙ্গি ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠবে।

‘অনুদানের’ রাজনীতি

ছয়ের পাতার পর

বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। বাসমালিকরা ইচ্ছামতো ভাড়া বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটছে। অথচ সাধারণ মানুষের রোজগার নেই। এই অবস্থায় মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাঁচশো টাকার অনুদানে যে কোনও সুরাহাই হয় না। কারণ, তার বহুগুণ টাকা তাঁদের মূল্যবৃদ্ধিতে বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। এ-সব নিয়ে তৃণমূল সরকার নীরব। উপরন্তু এই সরকার হাসপাতালগুলিতে বরাদ্দ বেশির ভাগ ওষুধই বন্ধ করে দিয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ শুরু করে দিয়েছে। ওষুধ ছাঁটাই করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যসাথীর নামে মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগটিকে কেড়ে নিয়ে বিমা-নির্ভর করে দিয়েছে। স্কুলগুলিকে বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। সঙ্গে রয়েছে তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি, কাটমানির দাপট। খুন সন্ত্রাস বাড়ছে। নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ফলে ছিটেফোঁটা কোনও অনুদানই মানুষের ক্ষোভের আগুনকে চাপা দিতে পারছে না। তৃণমূল সরকারের লক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে সব ক্ষোভকে অনুদানের প্রলেপে চাপা দেওয়া, যাতে তাদের দুর্নীতি-লুঠ দেখেও মানুষ চুপ করে থাকে। এই একই রাজনীতি সিপিএম করেছে, বিজেপি সহ অন্য দলগুলি যে যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে করছে। এখন সিপিএম নেতাদের লক্ষ্য, অন্য আর পাঁচটি ভোটবাজ দলের মতোই, মানুষের বেড়ে চলা এই ক্ষোভকে ভোটের বাক্সে নিয়ে গিয়ে আবার যদি গদিতে বসা যায়। কিন্তু সিপিএমের রাজনীতি মানুষের অতি চেনা। তাই মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করছে না।

তা হলে পথ কী? আজ সত্যিই মানুষের জীবনের দুর্গতির স্থায়ী সমাধান করতে চাই বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা। চাই সমাজ বদলের রাজনীতির চর্চা। যে রাজনীতি চর্চার ফলে মানুষ ধরতে পারবে তার জীবনের দুরবস্থার আসল কারণগুলো। ধরতে পারবে এই অনুদানের রাজনীতির পিছনে কোন মতলব কাজ করে। বুঝতে পারবে, এসব মানুষের জীবনের প্রকৃত কল্যাণ না করে দুরবস্থাকেই স্থায়ী করে রাখে। তাদেরই দেওয়া বিপুল করের টাকার অতি নগণ্য অংশ ছুঁড়ে দিয়ে মানুষকে ভোটের জন্য দায়বদ্ধ করে বেঁধে রাখে। আজকের দিনে এটাই বিপ্লবী রাজনীতি। এই রাজনীতির চর্চাই মানুষকে তাদের যথার্থ প্রাপ্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে এবং এর ফলে মানুষ ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্ঘশক্তিতে পরিণত হবে।

বিপিটিএ-র শিক্ষা কনভেনশন

৬ মার্চ কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পিপিপি মডেলের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এক শিক্ষা কনভেনশন হয়। পিপিপি মডেলের খসড়া অনুসারে স্কুলের জমি, বাড়ি ইত্যাদি বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিক্ষার মাধ্যম, সিলেবাস, ফি ইত্যাদি সবই তারা নির্ধারণ করবে। সম্প্রতি ২০৩টি প্রাথমিক ও ৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধকরে দেওয়া হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা অভিযোগ করেন, মুখে বিরোধিতা করলেও রাজ্য সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র অনলাইন শিক্ষা চালু সহ সমস্ত কিছুই কার্যকর করছে। এর বিরুদ্ধে তিনি সর্বস্তরের শিক্ষক অভিভাবকদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোসাব্বর হোসেন।

মহান ২৪ এপ্রিলের আহ্বান

একের পাতার পর

সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়ে সরকারি হাসপাতালগুলিকে অকেজো করে দেওয়া হচ্ছে, ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মালিকদের কব্জায়। মেহনতি মানুষের করের টাকায় গড়ে তোলা রেল, বিমানবন্দর, নদীবন্দর, খনির মতো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মুনাফা লুটের জন্য। সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি দু-পায়ে মাড়িয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক কালা আইন। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে রক্ত ঝরানো আন্দোলনে অর্জিত শ্রমিকের অধিকারগুলি। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে এইসব সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ওপর শোষণের জোয়াল ক্রমে আরও শক্ত করছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ পেতে সরকারগুলি শ্রমিক শ্রেণির ঘাম-রক্তের বিনিময়ে মালিকদের সিন্দুক ভরিয়ে তোলার অবাধ ব্যবস্থা করে চলেছে। পরিণামে, দেশের মানুষের এই চরম দুরবস্থার মধ্যেও ভারতে বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন অর্থাৎ ১০০ কোটি) সম্পদের মালিকের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪২। বৈষম্য আজ এমনই মাত্রাছাড়া যে, দেশের সবচেয়ে ধনী ৯৮ জন ধনকুবেরের হাতে জমা হয়েছে সবচেয়ে দরিদ্র ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের সম্পদের সম-পরিমাণ অর্থ। আর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা যাতে গড়ে উঠতে না পারে, সে জন্য সমস্ত সরকারই অপসংস্কৃতি ও মদ-মাদকের ঢালাও প্রসারে মদত দিচ্ছে। যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সমাজ জুড়ে বইয়ে দিচ্ছে নোংরা যৌনতার স্রোত। শোষিত-অত্যাচারিত মানুষ যাতে এই অন্যায়ের মোকাবিলায় জোট বাঁধতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে নানা কৌশলে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে জাত-পাতের ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতার বিষ। ইতিহাস বিকৃত করে, অবাধে অসত্য, অর্ধসত্য প্রচার করে, সংখ্যালঘু মানুষকে গায়ের জোরে দমন করে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সংস্কার বাড়ছে। বাড়ছে আতঙ্ক ও অনৈক্যের মানসিকতা।

সাধারণ মানুষ যখন এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন, তখন কোনও সংসদীয় দলকেই কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে পথে নেমে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে দেখা যাচ্ছে না। ভোটের স্বার্থেও সংসদীয় দলগুলি আগে যেটুকু প্রতিবাদী আন্দোলন করত, এখন তাও করছে না। যে বামপন্থী দলগুলির কর্তব্য ছিল শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাস্তায় জনগণকে টেনে আনা, কমিউনিস্ট নামধারী সেই বড় দলগুলিও সংসদীয় রাজনীতির জাবর কেটে চলেছে। তাদের যাবতীয় উৎসাহ ও কর্মকাণ্ড শুধু ভোটকে কেন্দ্র করে। যে কোনও উপায়ে ভোটে জিতে ক্ষমতা ভোগ করতে সামান্যতম নীতি-নৈতিকতার ধারও আজ ধারছে না তারা।

এই অবস্থায় সংকটগ্রস্ত সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রামের একমাত্র সাথী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। গণমুক্তির স্বপ্ন বুকে নিয়ে আজ থেকে ৭৪ বছর আগে এই দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ যুগের অন্যতম প্রধান মার্ক্সবাদী দার্শনিক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বুঝেছিলেন, শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে এদেশে স্বাধীনতা এলেও গণমুক্তি অর্জিত হয়নি। দেশের মেহনতি মানুষের ওপর শোষণের জোয়াল চাপিয়ে মুনাফা লুটের লক্ষ্যে ব্রিটিশের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। মার্ক্সবাদের শিক্ষা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে না পেরে কমিউনিস্ট নামধারী এ দেশের বড় বামপন্থী দলটি পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত করার পরিবর্তে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে কাজ করছে। এই অবস্থায় দেশে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে মাত্র কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ়পণ এক সংগ্রাম শুরু করেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। জন্ম নেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল। সেই থেকে এই দলটি শাসক শোষক শ্রেণির সমস্ত আক্রমণ উপেক্ষা করে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে শোষিত মেহনতি মানুষের প্রতিটি লড়াইয়ে সামিল রয়েছে।

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ও তার তল্পিবাহক সরকারগুলি খুব ভালো করেই জানে, এস ইউ সি আই (সি)-ই দলটির মধ্যেই রয়েছে তাদের মৃত্যুবাণ। তারা জানে, একমাত্র এই দলটিই অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে তুলতে এই শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তাই এই দলটির কার্যকলাপ কোনও মতেই যাতে প্রচারের আলোয় না আসে, সে বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদমাধ্যম। এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে জনগণের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে প্রায়শই তাই চলে নির্মম পুলিশি অত্যাচার। শাসক দলের অনুগত দুষ্কৃতীবাহিনী ও দলদাস পুলিশের হামলায় প্রাণ যায়, রক্ত ঝরে, জেলবন্দি হতে হয় এ দলের বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের।

এই সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা বুকে নিয়ে সংগ্রামী বামপন্থার পথ ধরে অক্লান্ত হাঁটছে এস ইউ সি আই (সি)। এই পথেই এই সংগ্রামী বামপন্থী দলটি ক্রমাগত জায়গা করে নিচ্ছে জনগণের বুকের মধ্যে। মানুষ উত্তরোত্তর বুঝতে পারছে, এই দলটিই তার দাবি আদায়ের, অধিকার রক্ষার লড়াই-আন্দোলনের একমাত্র বিশ্বস্ত সাথী। তাই এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে প্রতিটি আন্দোলনে আজ দলে দলে সামিল হচ্ছেন ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। লড়াই চলছে। কিছু কিছু দাবি আদায় হচ্ছে। আবার অপূরিতও থাকছে কিছু দাবি, যেগুলি অর্জন করতে গেলে এই দলটির শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়ে আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে দেশের প্রান্তে প্রান্তে শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে অত্যাচারিত মানুষের দল। তৈরি হচ্ছে জনসাধারণের আন্দোলনের নিজস্ব হাতিয়ার— গণকমিটি। সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এই গণকমিটিগুলি একের পর এক গড়ে তুলতে থাকবে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলন। সংগ্রামের এই পথ ধরে হেঁটেই একদিন অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শোষণমূলক ব্যবস্থাটিকে উচ্ছেদের লগ্ন উপস্থিত হবে। বিপ্লবের সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে দ্রুত এগিয়ে আনার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী গণআন্দোলনগুলিকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানাচ্ছে মহান ২৪ এপ্রিল।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

অস্ত্র হাতে মিছিলের প্রতিযোগিতায় বিজেপি-তৃণমূল

নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

রামনবমী উপলক্ষে অস্ত্র হাতে মিছিলের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

রামনবমী উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বিজেপির সঙ্গে অস্ত্র হাতে মিছিলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে তাতে এ রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিস্মিত। তৃণমূল কংগ্রেস একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করছে, আবার অন্যদিকে জনসমক্ষে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মতো আচরণ করছে—এই দ্বিচারিতাকে কোনওভাবে মানা যায় না। মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি সহ নানা সমস্যায় মানুষ যখন জেরবার তখন কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলগুলি মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ভোটের দিকে তাকিয়ে এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।

দীর্ঘ আন্দোলনে বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবার আইনি স্বীকৃতি আদায়

বাইক-ট্যাক্সি চালকদের দীর্ঘ আন্দোলনের জয় ঘোষিত হল। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা সাবার্বন বাইক-ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়নের দাবি ছিল, বাইক-ট্যাক্সি পরিষেবাকে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। এদের উপর পুলিশি জুলুম বন্ধ করতে হবে।

৬ এপ্রিল কলকাতার কসবায় পরিবহণ ভবনে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা ও অ্যাপ-নির্ভর (ওলা, উবের, র‍্যাপিডো) কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি এবং অ্যাপ-নির্ভর পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই বৈঠকে কলকাতা সাবার্বন বাইক-ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শান্তি ঘোষ সহ দুই প্রতিনিধি।

এই বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী 'আইনানুগ স্বীকৃতি'র ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে শান্তি ঘোষ বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে বাইক ট্যাক্সি পরিষেবার সামাজিক উপযোগিতার কথা বলে আসছি। এই পরিষেবাকে 'আইনানুগ স্বীকৃতি' প্রদান এবং এই পেশায় নিয়োজিত বাইক-ট্যাক্সি চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের মর্যাদা প্রদান ও সামাজিক সুরক্ষার দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা ভারতের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রথম দুই চাকার ইউনিয়ন নথিভুক্ত করিয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। বাইক-ট্যাক্সিকে বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এটা আন্দোলনের জয়। এর ফলে এই পেশায় নিযুক্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক পুলিশি হয়রানি থেকে রক্ষা পাবেন। তিনি এই জয়ের জন্য সকল বাইক-ট্যাক্সি চালক, যাত্রীসাধারণ ও শুভানুধ্যায়ীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আজও অ্যাপ-নির্ভর কোম্পানিগুলি (ওলা, উবের, র‍্যাপিডো) বাইকারদের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং 'সামাজিক সুরক্ষা' সহ নানা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

আন্দোলনের এই জয়ের অভিনন্দন বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া ও আগামী দিনে আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ৭ এপ্রিল হাজরা মোড়ে বিজয় সমাবেশ হয়। হাজরা থেকে বাইক-ট্যাক্সি চালকদের বিজয় মিছিল যদুবাবুর বাজার পর্যন্ত যায়।

হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া অগণতান্ত্রিক ও অবৈজ্ঞানিক

সমস্ত অ-হিন্দিভাষীদের উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদীয় সরকারি ভাষা কমিটির ৩৭তম মিটিং-এ বলেছেন, হিন্দি হবে ভারতের একমাত্র ও সব ভাষাভাষীদের সংযোগ রক্ষাকারী সরকারি ভাষা। অথচ ১৯৬৩ সালে সংসদে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজিও ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে থাকবে। পরবর্তীকালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই নীতি আবার গৃহীত হয়েছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য এর ঠিক বিপরীত। এখন অমিত শাহ ঠিক উল্টো পথে হেঁটে ইংরেজিকে বাতিল করে হিন্দি চাপিয়ে দিতে চাইছেন। ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে অ-হিন্দিভাষী জনগণের উপর হিন্দি চাপানোর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। এটা মেনে নেওয়া যায় না। ইংরেজি হল ভারতীয়দের কাছে প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক জ্ঞান অর্জনের দরজা। দেশের সাধারণ মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা বোঝেন। অথচ এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষ ইংরেজি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। বিপরীতে ধনী পরিবারের লোকেদের এই শিক্ষার সুযোগ থাকবে। ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়বে।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' স্লোগানকে কার্যকর করতে এবং জনগণকে ধর্মীয়, ভাষাগত এবং আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করতে চাইছে। মানুষ যখন পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, বেকারত্বের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তখন বিজেপি সরকার এই সব জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

আমরা বিজেপির অগণতান্ত্রিক ও অবৈজ্ঞানিক এই ভাষা নীতির তীব্র নিন্দা করছি, জনগণকে তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সবশেষে জনসাধারণকে সরকারের নানা জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে চলতে থাকা গণআন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শোষিত জনগণের দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠা ঐক্যে কোনও ফাটল ধরাতে না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

৮০০টি জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার

প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল তমলুকে

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৮০০টি জীবনদায়ী ওষুধের ব্যাপক দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকার হাসপাতালে ২৮৩টি ওষুধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসাথী ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসাকে বিমানির্ভর করে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক এবং সিএমওএইচ দপ্তরে পাঁচ দফা দাবিপত্র পেশ করা হয়। প্রতিবাদ মিছিলের পর দামবৃদ্ধির সার্কুলারে অগ্নিসংযোগ করেন প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (পি এম পি এ আই)-র জেলা সম্পাদক রামচন্দ্র সাঁতরা। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক অর্জুন ঘোড়ই, প্রণব মাইতি, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ।

বন্ধ লোকাল ট্রেন চালুর দাবি

করোনার অজুহাতে ট্রেন বন্ধ হয়েছিল। এখন সব কিছু স্বাভাবিক হলেও দীঘা-পাঁশকুড়া রুটে পূর্বের মতো লোকাল ট্রেন চালু না হওয়ায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার। অবিলম্বে বন্ধ লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে ৩ এপ্রিল পরিবহণ যাত্রী কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

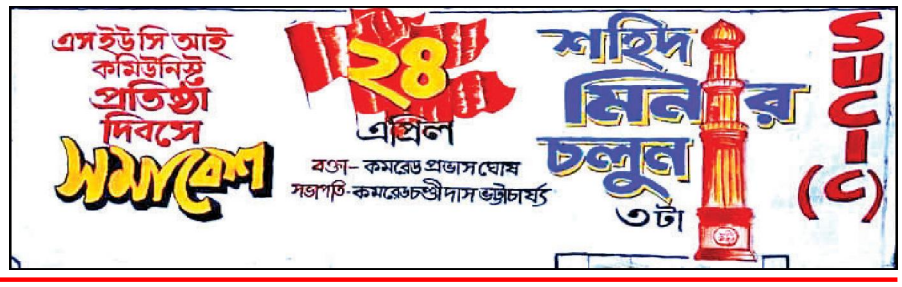

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com